Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 24-33
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' : নারীর স্বর, নারীর দাবী

সহেলী ঘোষ
গবেষক (পিএইচ.ডি), বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Abstract:

'Vidyasundar' was written by poet Bharatchandra during the turbulent period of eighteenth century Bengal. In 'Vidyasundar', the voices of women and demands of women are clearly expressed. The female characters in 'Vidyasundar' are self-respecting and confident. The expression of women has evolved as well as the evolution of the human mind over time. They no longer suffer inferiority. They no longer hide their minds. They do not think their husband is the only one right. They are not ashamed to express their desires. They can express themselves on their own.

Key words: Eighteenth century Bengal, Bharatchandra, 'Vidyasundar', Voices of Women, Demands of Women.

ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনাকালে মঙ্গলকাব্যের আদল গ্রহণ করলেও এবং নামে মঙ্গলকাব্য হলেও আসলে তা প্রকৃত মঙ্গলকাব্য নয়। তা অষ্টাদশ শতকের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'নূতনমঙ্গল'। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র কাব্যটি রচনা শেষ করেন। বস্তুত, এই সময়টা মঙ্গলকাব্য রচনার জন্য আদর্শ সময় ছিল না। অস্থির সময় মানুষের মনকেও অস্থির করে তুলেছিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হচ্ছিল পুঁজিবাদের। অর্থের লোভে মানুষ গ্রাম থেকে নগর অভিমুখী হচ্ছিল। গড়ে উঠছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অরাজকতা তথা দোলাচলতায় মানুষের অন্তর্জগতের অবস্থানও পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস আর স্থির থাকছিল না। সংশয়ে এসেছিল মনে। এই সময় ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ইজারাদারদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশগুলি ধীরে ধীরে রাজস্বের পাকে-চক্রে পড়ে নিজ নিজ অবস্থান ও সম্মান থেকে চ্যুত হতে থেকেছে। পরিবর্তে বিদেশী বণিকরা যারা বাংলাকে তাদের ব্যবসায়িক কেন্দ্র করেছিল তাদের দেওয়ান বা মুন্সিরাই হয়ে উঠেছে ধনকুবের। এমনকি জমিদাররা রাজস্ব পরিশোধের জন্য এই নবগঠিত ধনিক সম্প্রদায়েরই মুখাপেক্ষী থেকেছে। রাজারাও আর আগের মতো নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারছিলেন না। ফলে তাঁদের আশ্রয়ে রচিত কাব্যে ক্ষণিক চিত্তবিনোদনই প্রাধান্য পাচ্ছিল। সময়ের অভিঘাতে নতুন যে মনোভঙ্গী দেখা দিল সামাজিকের মনে, তার প্রকাশও কাব্যে পাওয়া যায়। আবার অষ্টাদশ শতকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ধীরে ধীরে অবসানের সঙ্গে জন্ম হচ্ছে পুঁজিবাদের। অর্থের লোভে মানুষ গ্রাম থেকে নগর অভিমুখী হচ্ছে। গড়ে উঠছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই সময়কালে রাজনৈতিক অরাজকতা আর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করেছিল মানুষের চেতনায়।

বহির্জগতের দোলাচলতায় মানুষের অন্তর্জগতের অবস্থানও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এই পরিবর্তনের ছবি ফুটে উঠেছে 'অন্নদামঙ্গল'-এ।

মঙ্গলকাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তবে এক্ষেত্রে কাব্য রচনার প্রকৃত কারণ কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরবগাথার মাধ্যমে রাজার মনোতুষ্টি। দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। আখ্যানটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত-১)অন্নদামঙ্গল, ২)বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল এবং ৩)অন্নপূর্ণা মঙ্গল বা মানসিংহ। দেবী অন্নদা তিনটি খণ্ডে ক্ষীণ যোগসূত্র রক্ষা করেছেন মাত্র। আমাদের আলোচ্য 'অন্নদামঙ্গল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' গড়ে উঠেছে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী নিয়ে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে এই খণ্ড পৃথক ভাবে রচিত হয়েছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় তা মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানের মূল ক্রমটি হল – যুবরাজ ও রাজকন্যার গোপন প্রেম, রাজকন্যার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া, রাজার কোপ ও যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড এবং পরবর্তীকালে দণ্ড মকুব ও বিবাহ। এই মোটিফটি ভারতচন্দ্র কোথা থেকে পেলেন এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা দরকার সংস্কৃতে এই কাহিনী বহুদিন ধরে চলে আসছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিলহ্নের 'চৌরপঞ্চাশিকা', বররুচির নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দরম' প্রভৃতি। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলা কাব্যে দুই-তিন শতাব্দী ধরে শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ, কৃষ্ণরাম দাস, কবিবল্লভ প্রাণরাম প্রমুখ এই কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের হাতে এসেই তা প্রথম কাব্য গুণ লাভ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় বাংলায় লেখা সকল 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যই দেবী মাহাত্ম্য প্রচারক মঙ্গলকাব্য। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের বাতাবরণের কথা মনে রাখতে হবে। সেই অস্থির সময়ে পৌরাণিক বা লৌকিক কোনো দেবতার প্রতিই মানুষের বিশ্বাস-ভক্তি আর অটল ছিল না – তা ক্রমশ হয়ে পড়েছিল শিথিল। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ তাই মঙ্গলকাব্যের একটি প্রলেপ মাত্র দিয়ে মানবিক প্রণয় কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে।

তবে তা শুধুমাত্র মানবিক প্রণয় কাহিনী হয়েই থাকেনি। সেই সঙ্গে তা নারীর স্বরকে শুনিয়েছে। নারীর দাবীকে প্রাধান্য দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে যৌনতায় নারীর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। এই ট্যাবুকে ভাঙলেন ভারতচন্দ্র। বিপরীত রতিতে নারীর সক্রিয়তায় সামাজিকের বাধা-নিষেধ অতিক্রম করলেন বিদ্যা চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে। যৌনাচারে নারীরও মতামত থাকতে পারে এই দৃষ্টিকোণের দেখা মিলল ভারতচন্দ্রে। কাব্যের নায়িকা শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী না হয়ে নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিজ মনের আকাঙ্ক্ষা নিজে পূরণ করেছেন। ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার, পুরুষের নির্বাচনই প্রধান এই তথাকথিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর কাব্যে। নারীরও সেক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচনের সম অধিকার থাকতে পারে বিদ্যা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্র তা পাঠকের কাছে তুলে ধরলেন। তাই 'বিদ্যাসুন্দর' রাজসভার চিত্তবিনোদনের খোরাক হয়েও নারীর স্বাধিকারেরও মূল্যবান চিত্র হয়ে উঠেছে। বিদ্যা স্বাধীন, রুচিশীলা, সাহসী। নিজ পছন্দ অনুযায়ী স্বামী নির্বাচনের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে অধিক বয়স অবধি সে অনূঢ়া থেকেছে-

"প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কিবা হবে ইহার।।"[১]

-এহেন বিদ্যা সুন্দরের রূপ ও বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হয়েছে। তাকে সে নির্বাচন করেছে একান্তই নিজের মনের দায়ে আর সেই নির্বাচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকতে সে যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। এখানে সে নারীর নিজস্ব মত, নিজস্ব চাহিদা, নিজস্ব দাবীকে প্রকাশ করেছে অকপটে। এই নারীকে, এই নারীর মনোভাবকে বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে কি দেখা গেছে? বোধহয় না। এই নারী তথা এই নারীর মন তো সময়-জাত।

যাইহোক, ভারতচন্দ্র যখন 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করলেন তিনি মধ্যযুগীয় মনোভঙ্গী থেকে অনেক বেশী অগ্রণী হয়ে নারীর সক্রিয়তার ধারণাকে প্রকাশ করলেন। ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার , পুরুষের নির্বাচনই প্রধান এই তথাকথিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর কাব্যে। নারীরও সেক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচনে সম-অধিকার থাকতে পারে বিদ্যা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্র তা পাঠকের কাছে তুলে ধরলেন। বিদ্যা-সুন্দরের সম্ভোগ কখনই শুধুমাত্র পুরুষের সম্ভোগ নয়; তা একান্তই দুই নারী-পুরুষের মিলিত যৌনাচার। কবি লিখেছেন,-

"মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেম তরঙ্গে।।
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী।।
লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ।"[২]

-এই সক্রিয়তা নারীর যৌনাচার ভিত্তিক হলেও শুধুমাত্র যৌনতার নিরিখে তাকে বিচার না করে ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদার দাবীর কথা ভাবা যেতে পারে। বিপরীত রতিতে নারীর সক্রিয়তা তথা অধিক সক্রিয়তায় যে সামাজিক বাধানিষেধ ছিল তা অতিক্রম করলেন তিনি।

'বিদ্যাসুন্দর' অংশে 'দিবাবিহার' ও 'মানভঙ্গ' অংশে বিদ্যার নিদ্রা-কালে সুন্দর তার সঙ্গে বিহার করলে বিদ্যা অপমানিত বোধ করে এবং সুন্দরকে ধিক্কার জানায়-

"দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলু থালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান।"[৩]

বিদ্যা এই অপমান মেনে নিতে না পারায় সুন্দরকে ধিক্কার জানিয়েছে। এই ধিক্কারকে পুরুষ চরিত্রের স্খলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা যেতে পারে। আবার এই ধিক্কার যেমন পুরুষের অসংলগ্ন আচরণকে স্পষ্ট করে তেমনি নারীর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়কও হয়ে ওঠে। এমনকি মিথ্যা কলহ করার সময়ও বিদ্যা সোচ্চার থেকেছে নিজের আত্মমর্যাদার বিষয়ে-

"এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে।।
পরনারী মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন।।
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি।।"[৪]

-পুরুষকেও যে তার নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে নারীর এই দাবীটি বিদ্যার স্বরে স্পষ্ট। আবার বিদ্যা গর্ভবতী হলে তার মা যখন জানান বিদ্যা কামের জ্বালা মেটাতেই নিজ পছন্দানুযায়ী আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে,-

"বিদ্যার কি দেব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত টেলে।"[৫]

-নারীর চাহিদাকে মান্যতা দেওয়ার স্বর তো এখানে স্পষ্ট।

বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন প্রণয়ের কারণে বিদ্যা গর্ভবতী হয়ে পড়লে রাজরক্ষীরা সুন্দরকে গোপন সুরঙ্গ আবিষ্কারের মাধ্যমে বন্দী করে ও তাকে নিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করে। এই নগর প্রদক্ষিণ কালে সুন্দরকে দেখে পুরনারীরা তাদের নিজ নিজ পতির সঙ্গে তুলনা করেন এবং নিজ নিজ পতিদের অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেন। এটিই হল 'পতিনিন্দা' অংশ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য 'পতিনিন্দা' অংশ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের চিরাচরিত বিষয় নয়। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অপরাপর কবিদের কাব্যে পতিনিন্দার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই কবিদের কাব্যে সুন্দরের দুর্ভাগ্যের জন্য রমণীরা বিলাপ করেই শান্ত হন। পতিনিন্দা আর করেন না। মধ্যযুগীয় সমাজ পরিমণ্ডলে কোন হিন্দু রমণী অপরিচিত ব্যক্তির রূপের প্রশংসাও যেমন করেন না তেমনি জনসম্মুখে স্বামীর নিন্দাও করেন না। 'পতিনিন্দা' অংশই এমন একটি অবকাশ যেখানে তারা পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে পুরুষ জাতির প্রতি তথা নিজ নিজ পতির প্রতি তাদের আক্ষেপের কথা ব্যক্ত করতে পেরেছেন। এই কারণে অনেক কবি 'পতিনিন্দা' অংশটি এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভারতচন্দ্র। তিনি শুধু পতিনিন্দা প্রসঙ্গ এনেই থেমে থাকেন নি, সেই সঙ্গে সুন্দরের রূপে মোহিত পুর নারীরা নিজ নিজ পতি ভাগ্যে যে অতৃপ্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পতিনিন্দা প্রসঙ্গের বিস্তৃত উল্লেখের সঙ্গে তৎকালীন পরিবর্তিত সমাজে নারীর পরিবর্তিত মনোভঙ্গীরও প্রকাশ পাওয়া যায়। তাতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের পতিনিন্দার একঘেয়েমির পরিবর্তে এক সামাজিক দৃষ্টিকোণ উঠে আসে। 'পতিনিন্দা' অংশে দেখা যায় পুরনারীরা সুন্দরকে দেখে বলছেন,-

"চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি।।
কিবা বুক কুবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ।।
ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ি।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি।।
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।।
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন।।
বিদ্যার করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা।।

দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি।।"[৬]

'পতিনিন্দা' অংশে দেখা যায় কিছু পুরনারীদের স্বামীরা শারীরিক কারণে অপূর্ণ বা বিকৃত। ফলস্বরূপ তাদের দাম্পত্য জীবনও অপূর্ণ। সেখানে কারো আক্ষেপে ধরা পড়েছে পতির কুরূপ বা অঙ্গহানির কারণে অতৃপ্ত কামের কথা-

"এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালা মুখ।।
সাধ করি শিখিলাম কাব্য রস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।।
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে।।
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।।"[৭]

এবং-

"মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।।
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য।।"[৮]

-এখানে নারী তার রূপ-যৌবন, সাজ-সজ্জা পতির সামনে তুলে ধরার বাসনা থেকে বঞ্চিত। তাই তার আক্ষেপ। কারো পতি স্থূল। তাই সে জানায়-

"আর রামা বলে বুড়া মাথায় ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে ধূর।।
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুড়ো পেট।।
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একবার নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন।।
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে।।"[৯]

আবার কারো স্বামী বেঁটে হওয়ায় সে জানায়-

"আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাও পাও এ বড় আনন্দ।।
বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়।।
তাপেতে হইনু জরা না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ।।"[১০]

-এই দুই নারীর পতি যথাক্রমে স্থূল ও বেঁটে হওয়ায় তারা তাদের অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্ক্ষার কথা এখানে ব্যক্ত করেছে। আবার যার স্বামী রাজকর্মচারী এবং জীবিকার কারণে ব্যস্ত থাকায় স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে অপরাগ, সেখানে স্ত্রীর অবস্থার কথা সে জানায়,-

"রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে।।
নারী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কাম জ্বরে সে বলে উল্বণ।।"[১১]

-স্বামী বৈদ্য হলেও স্ত্রীর স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদার খবর রাখে না। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষের মনোভাব যেমন ফুটে উঠেছে, নারীর অসহায়তার কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি নারী নিজে তার অতৃপ্ততার কথা ব্যক্ত করায় নারীর স্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আবার কারো স্বামী কৃপণ। সে জানায়-

"অভাগীর পতি নিকাশের মুহরী।
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে।।
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়।।"[১২]

এবং যার স্বামী কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে অপরাগ সে জানায়-

"দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন।।
সদাভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়।।
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতরায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়।"[১৩]

-তারা স্বামীকে শুধুমাত্র 'পরি পরম গুরু' না ভেবে অকপটে তাদের দোষ-ত্রুটির কথা ব্যক্ত করেছে। সেখানে কোনো আবরণ দেননি তারা। স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে নিজের খেদ। চিহ্নিত করেছে স্বামীর অপূর্ণতাকে।

আবার কৌলীন্য প্রথার কারণে অসম বা বহু বিবাহের বলি হয়েছেন কেউ কেউ। ফলত সেখানেও দাম্পত্য জীবন অপূর্ণই। সেখানে কখনও নাবালক কখনও আবার বৃদ্ধ স্বামীর পত্নী হতে বাধ্য হয়ে জীবন-যৌবন দুই থেকেই তারা বঞ্চিত। তাই যে নারীর স্বামী নাবালক, সে জানায়-

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।।"[১৪]

কেউবা জানায়-

"বিয়া কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে।।

বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আটি।।
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার।।
সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।"[১৫]

আবার কারো পতি বৃদ্ধ হওয়ায় সে জানায়-

"আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া।।
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিৎ।।"[১৬]

-এই নারীদের স্বামীরা তাদের কামক্ষুধা মেটাতে অপরাগ। এই নারীর আক্ষেপ, এই নারীর দাবী এক যৌবনবতী নারীর দাবী। সামাজিক কারণে সামাজিক দাবীকে মান্যতা দিয়ে তারা বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ থেকে তারা বঞ্চিত এবং সেই বঞ্চনাকে তারা মেনে নিতে পারেনি। তাদের কণ্ঠস্বরে যে যৌনতার দাবীর কথা উঠে এসেছে তাতো ব্যক্তির দাবী। প্রতিটি পুরুষের যে অধিকার আছে নারী বলে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন তারা? তাই তো সুন্দরকে দেখে নিজ নিজ পতিদের অপূর্ণতার কথা বলে তারা এক প্রকার নিজ অধিকারের প্রসঙ্গই তুলেছে। এই অংশে কৌলীন্য প্রথা শাসিত সমাজে নারীর যন্ত্রণার কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক অগ্রণী হয়ে নারীর স্বরকে প্রকাশ করেছে, নারী মনের চাহিদাকে-দাবীকে প্রকাশ করেছে।

'পতিনিন্দা' অংশ কৌলীন্য প্রথা শাসিত সমাজে নারীর যন্ত্রণার কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক অগ্রণী হয়ে নারী মনের চাহিদাকে, দাবীকে প্রকাশ করেছে। একে শুধু যৌনতার নিরিখে না দেখে ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদার কথা ভাবা যেতে পারে। পতি-নিন্দায় মুখর নারীরা প্রত্যেকে স্পষ্টভাবে দাবী করেছে কামের অধিকার। যেখানে তারা পতির অঙ্গহানির প্রসঙ্গ আনেন সেখানে তা শুধুমাত্র কৌতুক উৎপাদন করে তা নয়, সেই সঙ্গে তা যৌবনবতী স্ত্রীর অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষার কথাও। বস্তুত, নারীরা পতিনিন্দার সঙ্গে সমাজকেও নিন্দা করেছেন। কৌলীন্য প্রথার ফলে যে অসম বিবাহগুলি হতো তার নিন্দা করেছেন। সমাজের অসমতাকে নিন্দা করেছেন। ভারতচন্দ্র এই 'পতিনিন্দা' অংশে সেই সামাজিক প্রথার ভয়াবহতার রূপটিকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কশাঘাতে ব্যক্ত করেছেন। 'পতিনিন্দা' অংশ বা বিদ্যার সিদ্ধান্ত –এই মনোভঙ্গী কখনই মধ্যযুগীয় নয়। এই মনোভঙ্গী পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে জন্ম নেওয়া নতুন জীবনবোধ পূর্ণ। এই বোধ নারীর স্বরকে শোনে, নারীর স্বরকে মর্যাদা দেয়, নারীর দাবীকে প্রকাশ করে।

অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রীয় ভয়াবহতার প্রত্যক্ষ ফলভোগী ভারতচন্দ্র। অস্থিরতা অশান্তির আবহে ধর্মকাব্যে নব-ভাবনা ও নব-মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটালেন কবি। পুরোনো যা কিছু বিশ্বাস তাঁর বুদ্ধির শানিত ধারে বিক্ষত। ভারতচন্দ্রের প্রগতিশীলতার অন্যতম একটি দৃষ্টান্ত কৌলীন্য প্রথার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব। আবার নারীদের 'পতিনিন্দা' অংশে আপাত রঙ্গ-রসিকতার আড়ালে তিনি জীবনের প্রবঞ্চনাকে উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন।

'বিদ্যাসুন্দর' অংশে একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র হীরা মালিনী। সে সমাজের খেটে খাওয়া নিম্ন বর্গের এক নারী। সে টাকা-পয়সার হিসাবে ছল-চাতুরী করে। সে হাটে গেলে দোকানীরাই ঠকে যাওয়ার ভয় পায়। কিন্তু সে দরিদ্র হলেও কারো উপর নির্ভরশীল নয়। সে স্বাবলম্বী। তার স্বাবলম্বনই তার আত্মবিশ্বাস। তার জীবনে দারিদ্র-দুর্দশা, ছল-চাতুরী থাকলেও – সেই সঙ্গে তার নিজস্ব জীবিকা ও স্বাবলম্বন তাকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী করেছে। সেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই তো অনাত্মীয় যুবক সুন্দরকে সে আশ্রয় দেয়। তার স্বাবলম্বন আর আত্মবিশ্বাসই হয়তো তাকে নির্ভীক করে তুলেছিল। তাই কোটালের অনুচিত কথায় সে কোটালকেও নির্ভয়ে বলতে পারে,-

"হীরা বলে আর বেটা তোরে ভয় করে কেটা।"
তোর গুণপনা জানে সর্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা।।
... ...
লোকের ঝি বহু লয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিতে পারি কয়ে।।"[১৭]

আবার 'সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ' অংশে দেখি নাগরীরা সুন্দরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলছে,-

"এ কি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর বকুল মূলে।
মোহনিয়া চাঁদে চাঁদ পড়ে ফাঁদে
রতি রতিপতি ভুলো।।
দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমনী।
করবী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি।।"[১৮]

-শুধু পুরুষেরাই যে নারী রূপ দর্শনে মুগ্ধ ও কামাসক্ত হয় তা নয়। নারীরাও পুরুষের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়, কামাসক্ত হয় এবং সেই মুগ্ধতা ও কামাসক্তিকে প্রকাশও করতে পারে অকপটে। এই অংশে নারীর স্বরের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে। নাগরীরা তাদের মনের কথা স্পষ্টভাবে আরও জানিয়েছে-

"আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
বিবাগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগরপারে।।
কহে একজন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।।
আর জন কয় এই মহাশয়

চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।।
ধিক বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে।
এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে।।
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা।।"[১৯]

-নাগরীদের খেদের মধ্যে যেমন তাদের অতৃপ্তির কথা আছে, তেমনি তাদের আকাঙ্ক্ষার কথাও আছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই তাদের চাহিদা তাদের দাবী হয়ে উঠেছে। এবং সেই দাবী উচ্চারণে তারা মোটেই কুণ্ঠিত নয়। বরং তারা সোচ্চার। তাদের স্বর সেখানে স্পষ্ট। আসলে সময়ের বিবর্তনের ধারায় মানুষের মনেরও বিবর্তন ঘটতে থাকে। আর ভারতচন্দ্র সেই বিবর্তনকে চিত্রিত করেছেন 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নারীর স্বর-এ, নারীর দাবীতে।

তথ্যসূত্র:

১। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩।
২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৫।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৫।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১০১।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৪।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৪।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৭।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৮।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৮।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫-১১৬।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। কবি ভারতচন্দ্র, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
২। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
৩। ভারতচন্দ্র, মদনমোহন গোস্বামী (সম্পাদক), সাহিত্য একাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০১৪।
৪। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।
৫। রাজসভার কবি ও কাব্য, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫।